OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 197 - 208
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 197 - 208
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মৎস্যজীবী থেকে মউলে : পেশা পরিবর্তনে ভাষার নির্মাণ, একটি সমাজভাষাকেন্দ্রিক অনুসন্ধান

প্রিয়াঙ্কা মিস্ত্রী
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: priyankamistry521@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Sundarban, Occupation, Fisherman, Moule, Identity, Terminology, Belief-in-General, Changing Language.

Abstract

Sundarban is the largest mangrove forest in the world. At the same time, its recognition as a heritage site is significant not only in india but across the entire world. Moreover, the Sundarban is also rich in forest resources. The indian sundarban is composed of thirteen blocks of south 24 parganas and six blocks of north 24 parganas. But if on looks at the lives of the people in this predator-infested region, it becomes clear that this global recognition fades into the background, and their economic poverty and despair come to the forefront. In order to survive the daily struggle of life and to preserve their existence and indentity, the people here have to engage in an uncompromising conflict with nature. Many people have built their economic dependence around the Sundarbans, but at the same time, it also bears the stigma of countless live being lost. Due to economic hardship, the inhabitants of Sundarbans have become dependent on water-and forest-based occupations. Among these, fishing and honey collection are two major and riskey professions. However, alongside these traditional occupations are closly linked the rise and fall of society, culture customs, beliefs, and values, which are primarily expressed through language. The study of this intrinsic relationship between language and society is the subject of sociolinguistics.

Sociolinguistics is one of the most prominent branches of linguistics. As early as the beginning of the 1950s, sociolinguistics began to feel the necessity of this field. However, in the early stages, many linguists found it difficult to accept it, because they believed that language is not something separate from society. Therefore, the relationship between society and language seemed quite natural and not significant enough to become a separate area of study. But the various dimensions of language formation in society-such as education, profession, age and gender- have had a profound influence on language and have created diversity within it. This influence became impossible for linguists to ignore any longer.

Professional plays a remarkable role in shaping and expanding the relationship between society and language. During the breeding season of fish,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 197 - 208
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

when fishing in the river is completely prohibited for fishermen, they turn to the forest to engage in honey collection. However, when they shift from being fishermen to becoming honey collector (Moule), their identity nature of work, language of work, culture, folk beliefs, and customs all undergo significant changes. The objective of this paper is to examine, from a sociolinguistics perspective, the kinds of changes and variation that occur in language alongside this occupational shift among the inhabitants of the Sundarbans.

Discussion

সুন্দরবনের মিশ্র সংস্কৃতিই বর্তমান যুগের গবেষকদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। এই আকর্ষণ ও চর্চার বিস্তারকে অধিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে ইউনেস্কো। সালটা উনিশশো সাতাশি, বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে সুন্দরবনের নাম ঘোষিত হল। আপাত অর্থে, প্রবন্ধের স্বার্থে বিশ্বজোড়া কৃতিত্বকে সরিয়ে রেখে, সুন্দরবনের ভৌগোলিক সীমারেখা স্পষ্ট করা বেশি প্রয়োজনীয়। বর্তমানে সুন্দরবন বাঙালি মনের মতো দ্বি-খন্ডিত। সুন্দরবনের দুই তৃতীয়াংশ ভারতের মানচিত্রের বাইরে, বাংলাদেশকে গৌরবান্বিত করেছে। একভাগ করেছে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গোসাবা, ক্যানিং-১, ক্যানিং-২, জয়নগর-১, জয়নগর-২, মথুরাপুর-১, মথুরাপুর-২, কুলতলী, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা এবং সাগরদ্বীপ এই তেরোটি এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি-১, সন্দেশখালি-২, মিনাখাঁ, হাড়োয়া, হাসনাবাদ, এই ছয়টি মোট উনিশটি ব্লক ভারতীয় সুন্দরবনকে ভৌগোলিকভাবে সম্পূর্ণতা প্রদান করেছে। সুন্দরবনের মূল আকর্ষণীয় বিষয় হল - পৃথিবীর বৃহৎ ম্যানগ্রোভ অরণ্য ও একই সাথে এই অঞ্চলে পত্রজালকের মতো বিন্যস্ত থাকা একাধিক নদী-নালা। অরণ্য ও নদীর তথা জল ও জঙ্গলের পারস্পারিক এই সহাবস্থান সুন্দরবনের মানুষের যাপনকে পৃথিবীর ইতিহাসে স্থানাধীকারী করে তুলেছে। কিন্তু তাদের এই যাপনের অপর নাম সংঘর্ষ। 'জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ' প্রবাদটি সুন্দরবনের জলভাগ ও স্থলভাগের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিস্থিতি ও এখানকার মানুষের বসবাসকে ব্যক্ত করতে অদ্বিতীয় হলেও, এই প্রবাদের মধ্য দিয়ে আমরা সুন্দরবনবাসীর প্রাত্যহিক যাপনের খুব কাছাকাছি সম্পুর্ণরূপে হয়তো পৌঁছাতে পারি না। সুন্দরবনের অধিকাংশ পরিবারের একাধিক সদস্যরা জল-জঙ্গলকেন্দ্রিক পেশার সাথে যুক্ত, কিন্তু কেন যুক্ত এর উত্তরে রয়েছে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সংকট। এই পেশা অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তারা এই জল-জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হচ্ছে। তাই, সুন্দরবনবাসীর দৈনন্দিন যাপনের আনাচে-কানাচে উঁকি দিলে 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' এমত পরিস্থিতি নজরে আসবে। এই পরিস্থিতির কারণেই 'জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ' জেনেও এখানকার বাসিন্দাদের প্রকৃতি ও হিংস্র প্রাণীর সাথে নিয়ত লড়াই ও সংঘর্ষ করার মানসিকতা অর্জন করতে হয়।

বৈচিত্র্যের অপর নাম সুন্দরবন। সংস্কৃতি থেকে ভাষা, জনজাতি থেকে জীবপরিমণ্ডল, অরণ্য থেকে নদী, রাজনীতি থেকে অর্থনীতি সবকিছুই সুন্দরবনকে আপন মহিমায় সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তবুও, সুন্দরবনের জন-জীবনের ইতিহাস অনগ্রসর জাতির ইতিহাস হিসেবেই ব্যক্ত হয়। কারণ কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সেই অঞ্চলের মানুষের জীবনে তাৎপর্যপূর্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক দুরাবস্থা এখানকার মানুষকে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত করে তুললেও, হার না মানার অদম্য মানসিক জোর ও প্রতিদিনের জীবন যুদ্ধে সামিল হতে সুন্দরবাসী প্রচলিত একাধিক পেশার দ্বারস্থ হয়েছে। সুন্দরবনের অধিকাংশ মানুষই কেবলমাত্র একটি পেশাতে নিজেকে নিযুক্ত হয়ে থেমে থাকেনি, তারা একইসাথে একাধিক পেশার সাথে যুক্ত। এই বার্তা প্রতিষ্ঠা করে সুন্দরবনবাসীর অসম্ভব পরিশ্রমী হয়ে ওঠার কাহিনিকে। সুন্দরবনের প্রচলিত পেশার তালিকা নজর কাড়ার দাবি রাখে। কৃষিকাজ থেকে মৎস্যজীবি, কুম্ভকার, মাঝি, পানচাষি, ঘরামী, রাজমিস্ত্রি, কাঁকড়া-ব্যবসায়ী, বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি, ছুতোর মিস্ত্রি কি নেই সেই তালিকায়। সুন্দরবনের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির হওয়ায়, কৃষিকাজ এখানকার প্রধান পেশা। কিন্তু এই প্রধান পেশাটিকে প্রতিস্থাপিত করার মতো নিজস্বতা ধারণ করে আছে সুন্দরবনে প্রচলিত জল-জঙ্গলকেন্দ্রিক পেশা। জল-জঙ্গলকেন্দ্রিক পেশারও বর্তমানে অনেকগুলি প্রকারভেদ রয়েছে। যথা - মৎস্যজীবী, মধুসংগ্রহকারী, কাঁকড়া ধরে যারা, মীন ধরে যারা, টুরিস্ট বোটের ব্যবসায়ী এবং এক শ্রেণির মানুষ যারা শামুক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 197 - 208
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বা জোংরা গুড়ানো কাজের সাথে নিযুক্ত। কিন্তু সুন্দরবনের স্ব-মহিমা ধারণ করে আছে যে দুটি পেশা তা হল - মৎস্য শিকার ও মধু সংগ্রহ।

মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাপূর্ণ। কিন্তু মৎস্যজীবীদের নদীবক্ষে অনিশ্চিত জীবনযাত্রার পিছনে কেবল দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নয়, তাদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস প্রাণভ্রমরা হিসেবে কাজ করে। তাদের এই আত্মবিশ্বাসের মূলে রয়েছে তাদের লোকাচার, বিশ্বাস ও নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চা। তবে, তাদের এই নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চা সম্পূর্ণভাবে পৃথক পরিসরে আলোচনার দাবি রাখে। ভারতীয় সুন্দরবনে মৎস্যজীবী ও মউলেদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা প্রায় অসম্ভব। কারণ কেবল মৎস্যজীবী বা মউলেদের সম্প্রদায়কে ঘিরে নির্দিষ্ট কোন সরকারী জনগণনা আজও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সুন্দরবনে দু-ধরনের মৎস্যজীবী লক্ষ করা যায়। যথা - নদী বা খাঁড়িভিত্তিক মৎসজীবি ও সমুদ্রভিত্তিক মৎস্যজীবী। সুন্দরবনের নামখানা, কাকদ্বীপ, সাগরদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা এই অঞ্চলগুলি অর্থাৎ সুন্দরবনের পশ্চিমদিকটি সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায়, এখানকার মৎস্যজীবীরা বেশিরভাগ সমুদ্রকেন্দ্রিক মৎস্যশিকারে অভ্যস্ত। তপশিলি জাতি, উপজাতি ছাড়াও একাধিক সাধারণ জাতির মানুষেরাও মৎস্য শিকারের সাথে যুক্ত। সমুদ্রভিত্তিক মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার ক্ষেত্রে প্রধানত টলারের সাহায্য নেয়, যা মূলত ইঞ্জিন-চালিত। একে ফিসিং টলার বলা হয়। এই টলারগুলোর নামকরণও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ন। কারণ এর সাথে মৎস্যজীবীদের এক ধরনের বিশ্বাস জড়িত। এরা টলারকে মাতৃজ্ঞানে পুজা করে এবং সেই বিশ্বাস থেকে নিজের জন্মদাত্রী মায়ের নাম অথবা হিন্দুশাস্ত্রমতে বিভিন্ন দেবীর নামে নামকরণ করে থাকে। যেমন-মা লক্ষী, নিউ কাত্যায়নী, মা কমলা ইত্যাদি। বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য এই দু-মাস ব্যাতীত আষাঢ় থেকে চৈত্র পর্যন্ত মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে মাছ ধরার অনুমতি পায়। এই অনুমতিপত্রকে সুন্দরবনের এই অঞ্চলে লক্-বুক বলা হয়। যাতে টলারের নাম থেকে শুরু করে কতজন মৎস্যজীবি যাচ্ছে, কত তারিখে যাচ্ছে এবং কবে নাগাদ ফিরবে এসবের বিস্তারিত বর্ণনা থাকে। এছাড়াও এই অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের ব্যক্তিগতভাবে আলাদা পরিচয়-পত্র সরকার কতৃক প্রদান করা হয়। যাতে কোন দুর্ঘটনার স্বীকার হলে ঐ মৎস্যজীবীর পরিবার চার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা বীমা হিসেবে পাবে। প্রায় দুই সপ্তাহের খাবার ও পানীয় জল এবং মৎস্য শিকারের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে এই যাত্রা শুরু হয়। যাত্রা শুরুর দিন টলারে মালিকসহ অন্যান্য মৎস্যজীবীরা পুরোহিত ডেকে মা গঙ্গাদেবীর ও ইঞ্জিন থাকার কারণে বিশ্বকর্মার উদ্দেশ্যে পুজো দেয় এবং সবাই ঐদিন নিরামিষ খায়। টলারে তেরো থেকে সতের বা আঠারোজন লোক যায়। বঙ্গোপসাগরই এদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি টলারে ওয়ারলেস সিস্টেম থাকে, একে অন্যের বিপদে কিংবা কোন এলাকায় মাছ বেশি হচ্ছে সেই সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য। তবে, এরা ভারতীয় সীমানার মধ্যেই থাকে, তা অতিক্রম করলেই নেভির অফিসাররা জরিমানা করে। মোনা, বমলা, কড, নাকুরা, খয়রা, চাইনিজ ইত্যাদি জালের এবং দোণ বর্শির সাহায্যে মৎস্যজীবীরা মৎস্য শিকার করে। সকাল চ'টায় চা-বিস্কুট খেয়ে জাল ফেলে, তিন ঘন্টা জাল জলের তলায় থাকে। তারপর জাল তুলে মাছ বেছে, মাছ বরফের মধ্যে সুরক্ষিতভাবে সাজিয়ে রাখে। প্রায় পনেরদিন পরে এরা মাছ নিয়ে ঘাটে আসে, সেখান থেকে মাছ আড়তে চলে যায়। অক্সান পদ্ধতির মাধ্যমে মৎস্যজীবীরা মাছের যথাযথ বাজার মূল্য পেয়ে থাকে। নয় থেকে দশমাস পরে মোট আয়ের হিসেব হয়। টলারের মালিক পায় ঊনত্রিশ শতাংশ, বাকি একাত্তর শতাংশ মৎস্যজীবীদের। সুন্দরবনের দক্ষিণ (গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং) দিকটি ভূ-খন্ডের অভ্যন্তরীন ও শহরমুখী। এই ভৌগোলিক অবস্থানগত তারতম্যের কারণেই এই অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার পদ্ধতি ও সেই পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি ও বিশ্বাস খানিকটা পৃথক ধরনের। এদিকের মৎস্যজীবীরা মৎস শিকারের জন্য ডিঙ্গি নৌকার উপর বেশি নির্ভরশীল। ডিঙ্গি নৌকা ইঞ্জিন চালিত নয়, তাই প্রাকৃতিক দূর্যোগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অনেক ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে হয় মৎস্যজীবীদেরকে। সুন্দরবনের পশ্চিমাংশের মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার জন্য যে অনুমতিপত্র জোগাড় করতে হয় তাকে বোর্ট অফ লাইসেন্স (বি.এল.সি) বলা হয়। সকল মৎস্যজীবীরা এই পাসের সুবিধা না পাওয়ায় বিশাল অঙ্কের টাকার বিনিময়ে এই বি.এল.সি ভাড়া পাওয়া যায়। এই মৎস্যজীবীদের মধ্যেও প্রকারভেদ রয়েছে। যারা একটু বেশি গভীরে যায় তারা মূলত প্রতিপদে বেরোয় এবং একাদশীতে ফিরে আসে কিন্তু তুলনামূলক যারা মাঝনদীতে মাছ ধরে তারা কোটালের উপর ভরসা করে একাদশীতে বেরোয় এবং ষষ্ঠীতে ফিরে আসে। এরা বেনতি জাল(চুনো, চিংড়ী ধরার), খয়রা জাল (পার্সে, আমুদি) ফেলে। খেপের বোট বা চালান বোট গিয়ে প্রতিনিয়ত এদের থেকে সংগৃহীত মাছ আনে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 197 - 208
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এবং এদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে আসে। যারা বেশি গভীরে যায় তারা নদীর গায়ে সৃষ্টি হওয়া খাঁড়িতেই মাছ ধরে। তাদের নৌকাতে চারজন দাঁড়ি থাকে এবং একজন মাঝি বা মাস্টার যিনি হাল ধরে, তার কথাতেই নৌকার দিক নির্দেশিত হয়। এরা সাধারণত সরু সুতোর মনোফিল জাল ব্যবহার করে থাকে। নোঙর ফেলার পর থেকে এই জাল ফেলতে তিনঘন্টা সময় লাগে। জলে ছ'ঘন্টা ফেলা থাকে জাল। ছ'ঘন্টা পর এরা জাল তুলে মাছ ছাড়িয়ে মুগুর দিয়ে বরফ পিটিয়ে তার মধ্যে মাছকে সংরক্ষিত রাখে। আটদিন পর এরা ফিরে আসে এবং মাছ আড়তে পাঠায়, সেখানে আড়তদার একশো টাকায় দশ টাকা কমিশন কেটে এদের প্রাপ্য মূল্য ফেরত দেয়। এই টাকার একভাগ জাল, নৌকা ও বি.এল.সির জন্য বরাদ্দ হয়, তারপর মৎস্যজীবীরা নিজেদের অংশ ভাগ করে নেয়। মৎস্যজীবীরা যাত্রার শুরু করে যেমন পুজো-অর্চনার মাধ্যমে, তেমনি আটদিন পর যাত্রাশেষে মার বাদায় অর্থাৎ জঙ্গলে বনবিবি পুজো দিয়ে তবেই বাড়িতে ফিরে আসে।

বনজ সম্পদে ভরপুর হলেও, বর্তমানে সুন্দরবনবাসীরা আইন সম্মতভাবে বন থেকে কেবল মধু সংগ্রহ করতে পারে। মধু হল সুন্দরবনের শ্রেষ্ঠ বনজ সম্পদ। এখানকার অধিকাংশ মৎস্যজীবীই মধু সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু যখনই তারা পেশা বদলে ফেলে তখনই তাদের পরিচয়ও পাল্টে যায়। তারা হয়ে ওঠে মউলে। মউলেরা অধিকাংশ মৎস্যজীবী হলেও সুন্দরবনের সব মৎস্যজীবী কিন্তু মউলে নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে পড়ে মউলেরা কারণ তাদের কাজটাই স্থল ভাগকে কেন্দ্র করেই। মধু সংগ্রহ করতে যাওয়াকে বলা হয় মহালে যাওয়া। যে নৌকাতে মউলেরা যায় তাকে মহালের নৌকা বলা হয়। মউলেরা জঙ্গলকে বলে থাকে মার খামার এবং মৌমাছিকে পোকা নামেই সম্বোধন করে থাকে। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহেই সরকার কতৃক মউলেরা মধু কাটার পাস বা অনুমতি পেয়ে থাকে। চোদ্দদিনের মেয়াদ থাকে এই পাসের আবার দোলফা (মধু সংগ্রহের জন্য দ্বিতীয়বার যে অনুমতি দেওয়া হয়) পেলে পুনরায় যেতে পারে। সাতজন, ন'জন বা এগারোজন দলবদ্ধভাবে এই কাজ সম্পন্ন করে। এই দলে নৌকাটি যে ব্যক্তির তাকে সাজুনি বা সাজনদার বলা হয়। রওনা দেওয়ার যাবতীয় খরচ তার। বৃহঃস্পতি বারে মহালে যাওয়া নিষেধ। যাত্রা শুরুর দিনই প্রথমেই এরা মা বনবিবির স্মরণাপন্ন হয় এবং পুজা-অর্চনা করে থাকে। তারপর মধু কাটার যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে এরা নৌকায় উঠে গেল, সাজনদারের স্ত্রী নৌকাতে একঘটি জল ঢেলে নৌকা ঠেলে দেয়। এই জল ঢালার তাৎপর্য ঘটির জলের মতো মউলেরা নৌকা ভরে মধু আনতে পারুক। নৌকাতে একজন ব্যতীত সবাই জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। নৌকাতে যে থাকে তাকে ভুড়েল বা দারোগা বলা হয়। তার কাজ মোষের শিঙে ফুঁ দিয়ে মউলেদেরকে নৌকার অবস্থান জানানো এবং নৌকাতে রান্নার যাবতীয় কাজ-কর্ম করা। বাকি মউলেরা ভুড়েলকে মায়ের মতোই ভাবে। কারণ মায়ের মতোই খাওয়া-দাওয়ার সব দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকে। মউলেদের দলে আর একজন ব্যক্তি থাকে যাকে বাউলি বা গুণিন বা হুজুর বলে। তার মন্ত্রই মউলেদের বছরের পর বছর প্রাণ রক্ষার কবচ হিসেবে কাজ করে আসছে। বাউলি প্রথমে মাটিতে হাত রেখে মন্ত্র পড়ে বাঘের মুখ বন্ধ করে তারপর মউলেরা জঙ্গলে প্রবেশ করে। ভুড়েল ব্যাতীত বাকি মউলেরা লাইন দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে প্রথমে কোথায় মধুর চাক আছে তা খুঁজতে থাকে, এই খোঁজাকে ছাটা দেওয়া বলে। তারপর হেঁতালি পাতা বেঁধে লাঠির মাথায় ধোঁয়া করে প্রথমেই মৌমাছি তাড়ানো হয় সুকৌশলে। এই লাঠিকে বোলেন বা বাড়ন বলে। যে মৌমাছিগুলো ধোঁয়াতেও যায় না তাদেরকে হাত দিয়ে ধরে ফেলে দিতে হয়। এদেরকে এল্‌সে মৌমাছি বলে। আর যারা মধু তৈরি করে তাদের খাটনি মৌমাছি বলে। যে মধু কাটে তাকে কাটনি মউলে বা গেছুরে বা গাছলি বলে। সে প্রথমে মধুর চাকে দা দিয়ে দাগ কেটে নেয়। এই চাকের দুটি অংশ হয়। যেখানে মধু থাকে তাকে গালা বা মোম বলে। নিচের যে অংশে মৌমাছি থাকে তাকে ঢাঁড় বা বাস্‌না বলা হয়। বাস্‌না অংশে আঘাত করা হয় না। কারণ ওখানে মৌমাছির বাচ্চারা থাকে এবং পরের বছরে বাচ্চাদের টানে ওখানে মৌমাছিরা আবার আসবে। দাগ কাটার পর অল্প অল্প অংশে মধু কেটে হাড়িতে ভর্তি করা হয়। এই ভর্তি হাঁড়ি যে ব্যক্তি টেনে নৌকাতে আনে তাকে আড়িওয়ালা বলে। সন্ধ্যায় সবাই মিলে মোম থেকে চেপে মধু বার করে পরিষ্কার ড্রামে সংরক্ষিত করা হয়। এই কাজ সম্পন্নকালে যদি মউলেরা ঘন জঙ্গলে কোন কারণে একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন তারা মুখে 'কু' আওয়াজ করে এবং অন্যজন তা শুনে একইভাবে 'কু' দিয়ে পারস্পারিক যোগসাধন করে। মরশুমের প্রথম মধুটি হয় খলসে ফুলের এবং এটি একেবারে সাদা রঙের হয়। গুণগতমানে এটি শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়বারের সংগৃহীত মধুকে ভেজাল মধু ধরা হয় কারণ বিভিন্ন ফুলের (গরান, গেঁও, ক্যাওড়া) থেকে তৈরি, রং হালকা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 197 - 208
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হলুদ হয়। চোদ্দ দিনের মাথায় ফিরে মউলেরা প্রথম ফরেস্ট অফিসে মধু বিক্রি করে। যা বাজার মুল্যের থেকে অনেকটাই কম। এখানে মউলেদের মাথা পিছু পঞ্চাশ কেজি করে মধু দিতে হয়। এছাড়া সাজনদার বাড়তি পনেরো থেকে কুড়ি কেজির একটি কলসি পাবে। মউলেরা মহাল থেকে ফেরার সময় পুজো দেয়, যেটাকে মহাল ফেরত পুজা বলা হয়। এছাড়া প্রতিটি মউলে বিশ্বাস করে বাড়িতে তাদের স্ত্রীরা কতখানি নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সাথে প্রচলিত লোকাচারগুলি পালন করছে তার উপর তাদের আয় বৃদ্ধি হয়। মৎস্যজীবী ও মউলেদের নিজস্ব বিশ্বাস ও লোকাচারগুলি বর্তমান প্রবন্ধের নির্দিষ্ট স্তবকের আলোচ্য বিষয়। তবে, অনিশ্চিত জীবনে এদের প্রাণ ভ্রমরাকে টিকিয়ে রাখতে এগুলি জিয়নকাঠির ন্যায় কাজ করে।

ভাষাবিজ্ঞানের একটি জনপ্রিয় শাখা হল - সমাজ ভাষাবিজ্ঞান। ভাষাবিজ্ঞান যেমন ভাষার গঠন অর্থাৎ ধ্বনি, শব্দ, ব্যাকরণ, অর্থ নিয়ে চর্চা করে তেমনি, সেই ভাষা কীভাবে সমাজ ও মানুষের সংস্কৃতির সাথে ওতোপ্রতোভাবে সম্পর্কিত তা সমাভাষার পরিসরের আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। সমাজ ও ভাষার আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে চর্চা করাই সমাজভাষার মূল কাজ। ইংরেজিতে প্রথম 'সমাজভাষা' পরিভাষাটি ব্যবহার করেন হ্যাভার সি.কারি। তাঁর মতে –

> "...social functions and significations of speech factors offer a prolific field of research ...The field is now designated sociolinguistics...।"[১]

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষক লেবভ ১৯৭২ সালেই সোসিওলিঙ্গুইস্টিক্স পরিভাষাটির বিরুদ্ধে দ্বি-মত জানাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য –

> "ভাষাবিদ্যার সমস্ত কর্মই সামাজিক মানুষের ভাষা নিয়ে তার জন্য অতিরিক্ত একটি পরিভাষার (redundant) কোন প্রয়োজন নেই।"[২]

কিন্তু যখন এই লেবোভ নিজেই সমস্ত রকমের দ্বিধা কাটিয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের শিরোনাম রাখেন 'Sociolinguistic Patterns' তখন সমাজভাষা চর্চার অনুরাগীদের ভাবতে ভালোই লাগে যে লেবভ দ্বারা সেই দিনই 'সোসিওলিঙ্গুইস্টিক্স' পরিভাষাটিতে এবং তার চর্চার পরিসরে স্থায়ীভাবে শিলমোহর পড়ে গিয়েছিল। বিখ্যাত সমাজ ভাষাবিজ্ঞানীরা তাদের মতো করে মাত্রাগতভাবে অথবা বিষয়গতভাবে বিভাজন করে সমাজভাষা চর্চার পরিসরটিকে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন। ব্রাইট ভাষাবৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করে সমাজভাষা চর্চার সাতটি মাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন। ফিশম্যান তিনটি ভাগে এই আলোচনাকে বিকশিত করেছেন। এছাড়া গ্রিমশ, ট্রাডগ্রিল, আরভিন-ট্রিপ প্রমুখ গুণী ব্যক্তি তাদের আলোচনা ও গবেষণা দ্বারা সমাজভাষার চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাঙালি ভাষাবিদ্ হিসেবে ১৯৮৫ সালে পবিত্র সরকার ব্রাইটকে অন্তর্ভুক্ত করে মূলত ফিশম্যানের ফ্রেমকে কেন্দ্রে রেখেই সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাটি করেছেন। রাজীব হুমায়ুন আবার ট্রাডগ্রিলকে অনুসরন করেছেন। সমাজ ভাষাবিজ্ঞানী মৃনাল নাথ আবার সকলের থেকে এক ভিন্ন ও নবতর ফ্রেমে সমাজভাষা চর্চার ক্ষেত্রে চারটি বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। উল্লিখিত ব্যক্তিদের সমাজভাষাকেন্দ্রিক ফ্রেম বা আলোচনাগুলি নিঃসন্দেহে এক একটি নিজগুণে অদ্বিতীয় কিন্তু কোন একটি আলোচনাকে যদি নির্দিষ্ট করে না দেখি তবেই, আমরা সমাজভাষা চর্চার পরিসর ও ব্যাপ্তির একটি সম্পুর্ণ অবয়ব পেতে পারি। একইসাথে, সমাজভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সমাজভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলো রয়েছে সেগুলোরও সামগ্রিকতাও লাভ করতে পারি।

সুন্দরবনের নদী বা সমুদ্রে মাছের প্রজননের সুবিধার্থে আইনসম্মতভাবেই চৈত্র থেকে জৈষ্ঠ্য এই দুই থেকে তিনমাস সম্পুর্ণরূপে মৎস্য শিকার বন্ধ থাকে। কাকতালীয় ভাবেই চৈত্রের মাঝামাঝি অর্থাৎ ইংরেজি এপ্রিল মাসের পয়লা তারিখ থেকে গোটা এপ্রিল মাসের জন্য মউলেরা সরকার কতৃক মধু সংগ্রহের অনুমতিপত্র পেয়ে থাকে। সুন্দরবনবাসীর কাছে নির্দিষ্ট একটি পেশাকে নির্ভর করে দিন অতিবাহিত করা কষ্টসাধ্য। তাই, বছরের এই সময়টাতে তারা মধু সংগ্রহের কাজে যুক্ত হয়। কিন্তু এই পেশা বদলের সাথে আত্মপরিচয় ও ভাষা বদলের এক নিবিড় ইতিহাস জড়িত। কেন এই বদল ঘটছে তা সমাজভাষাবিদ্যার অন্তর্গত আলোচ্য বিষয় নয়, তাকে বুঝতে ও জানতে আমাদেরকে সমাজভাষাতত্ত্বের দ্বারস্থ হতে হবে। কিন্তু মৎস্যজীবী ও মউলে এদের ভাষা ও পেশা, সমাজের সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত তা নিশ্চিতভাবে সমাজভাষাগত একটি অনুসন্ধানের পরিসর তৈরি করে। কোন একজন নির্দিষ্ট সমাজভাষাবিজ্ঞানীর প্রদত্ত ফ্রেম ব্যাতিরেকে সামগ্রিকভাবেই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 197 - 208
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সুন্দরবনের মৎস্যজীবী ও মউলেদের ভাষায় সমাজভাষার কোন কোন মাত্রাগুলি পর্যবসিত তা আমরা এই প্রবন্ধে বুঝতে চেষ্টা করব।

ভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় বৈচিত্র্যময়তাকে কেন্দ্র করেই। সেই কারণেই সমাজভাষাবিজ্ঞানী ব্রাইট ভাষার ডাইভারসিটির উপরেই জোর দিয়েছিলেন। তিনি ভাষার সমাজতত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তা হল—

> "Who speaks (or writes) what language (or what language variety) to whom and when to what end?"[৩]

অর্থাৎ কে বলছে, কী বলছে, কাকে বলছে, কেন বলছে এবং কোথায় বলছে এই বিষয়গুলিই ভাষাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে। এছাড়াও অঞ্চলভেদ, সামাজিক শ্রেণি, নৃ-গোষ্ঠী, ধর্ম, জাতি, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদি ভাষার মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি করে। সুন্দরবনে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মানুষের বসবাসের কারণেই মিশ্র ভাষাগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। এখানকার মৎস্যজীবী ও মউলে উভয় পেশার সাথে যুক্ত মানুষদের থেকে সরাসরি তাদের কাজের বিষয় ও ভাষা সম্পর্কে ক্ষেত্রসমীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে তাদের ভাষাতে কী কী বৈচিত্র্য উঠে এসেছে তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। আবার, পেশা সমাজভাষা নির্মাণে এক বিশেষ মাত্রা বহন করে। পেশা পরিবর্তনে কীভাবে নতুন ভাষার নির্মাণ হচ্ছে, এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই বর্তমান প্রবন্ধের সূচনা হয়েছে। তাই বর্তমান স্তবকটি প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যতখানি জরুরী, ঠিক ততখানি আকর্ষণীয়। পেশা মানেই অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার চাবিকাঠি। একজন মৎস্যজীবীর আট থেকে নয় মাসে মোট আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। একজন মৌলের চোদ্দ থেকে পনেরো দিনের আয় প্রায় তিরিশ হাজার টাকা। তাদের নিজেদের কথায় অন্যান্য কাজের থেকে জঙ্গলে পয়সা বেশি। এই আর্থিক স্বচ্ছলতাকে স্বীকার করে নিলেও তাদের পেশাকেন্দ্রিক ঝুঁকির কথা আমরা ভুলতে পারি না। একজন মৎস্যজীবী হোক কিংবা একজন মৌলে তার এই পেশা তাকে নতুন করে আত্মপরিচয়ের মর্যাদা দিচ্ছে। মৎস্যজীবীর কাজ মাছ ধরা, কিন্তু জাতিগত কারণে তাদের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থান রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন এই পেশার সাথে যুক্ত থাকতে থাকতে, একসময় এই পেশাই তাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলতে ফেলতে আত্মপরিচয়কেও প্রভাবিত করে ফেলে। একজন জেলে মৎস্য শিকারের সাথে যুক্ত, আবার দীর্ঘদিন ধরে যে গ্রামে বসবাস করছে সেখানে হয়তো তার মতোই জেলের সংখ্যা অধিক। তখন ঐ গ্রামটি জেলে পাড়া হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। এভাবেই সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকের একাধিক গ্রামে একটি করে জেলে পাড়া আছে, মালো পাড়া আছে। একইভাবে যারা জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে যাচ্ছে তাদের মধ্যেও জাতি, শ্রেণি, গোষ্ঠীভেদে নিজেদের একটা অবস্থান রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন বংশপরম্পরায় এই মধু সংগ্রহের সাথে যুক্ত থাকায় তারা মউলে সম্প্রদায় হয়ে উঠেছে।

প্রথমত, সুন্দরবনে দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে অঞ্চলভেদে মৎস্যজীবী ও মউলেদের ব্যবহৃত ভাষাতে একাধিক উপভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাচ্ছে। যথা -

১। "...নোঙরটা পথম ফ্যালাবো, দিয়ে মেশিনের সাহায্যে জাল পড়বে ... আমাদের দেখা যাটে মাছ যখন বেশি লেগে গেছে তখন আর জাল ফ্যালাবো না...।"[৪]

এই বাক্যে প্রথম থেকে 'পথম' শব্দটি এসেছে। 'র' ব্যঞ্জনধ্বনিটির লোপ পেয়েছে আবার ফেলব থেকে 'ফ্যালবো' বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'এ' ধ্বনি 'অ্যা' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যার কারণে বাক্যটিতে বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে।

২। "...এবার জাল পাতলাম, তার ছ'ঘণ্টা পর জাল তোলব। জাল তুলে লৌকাই মাছ সব এট্টা এট্টা কুরে বাছতি হয়...।"[৫]

এই বাক্যটিতে 'পাতলাম' শব্দটির মাধ্যমে সামান্য অতীতকালে উত্তম পুরুষে 'লাম' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে, যেটি সাধারণত বরেন্দ্রী উপভাষাতে লক্ষ করা যায়। আবার নৌকা > লৌকা শব্দটি রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরছে, একইসাথে 'এট্টা' শব্দটি 'একটা' শব্দজাত। যেখানে 'ক' মধ্যস্বর লুপ্ত হয়ে অন্তঃস্থিত ব্যঞ্জনটি দ্বিত্ব হয়েছে। যা মূলত ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য।

৩। "...একমাসের পাস দেয়, একমাস হয়ে গিলি সরকারকে কিছু মধু দিতি হয়... আবার ওরা যখন পারমিশান দেবে তখন আমরা সবাই মাচ্ ধরতি যাব...।"[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 197 - 208
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই উক্তিতে গিলি, দিতি, ধরতি শব্দগুলিতে 'এ', 'ই'- কার রূপে ব্যবহৃত হয়ে স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। যা বঙ্গালী উপভাষাতে লক্ষ করা যায়। আবার মাছ> মাচ্ শব্দটি রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

৪। "...মা বনবিবির পূজো করি বাড়িতে তারপর নৌকো ঘাটে থেকে ছেড়ে দিয়ে অপিসি গিয়ে পাস নেবো। মধুর পাসটা অরা ওখান থেকে দেয়, মাছ-কাঁকড়ার বাড়িতেই থাকে...।"[৭]

এই বাক্যে অফিস> অপিসি শব্দটির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অধিকরন বিভক্তিতে 'ই' যুক্ত হয়েছে।

সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলের মৎস্যজীবী ও মউলেদের ভাষায় উচ্চারণগত কারণে যেমন ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক লক্ষ করা যাচ্ছে, তেমনি তাদের ব্যবহৃত শব্দের ব্যবহার (vocabulary) অর্থাৎ একই জিনিস বা বিষয়কে বোঝাতে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে, যা শব্দবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে যেমন—

নামখানা	পাথরপ্রতিমা	গোসাবা	পাখিরালয়
মাঝি		মাস্টার	
	আড়ৎ	খটি	
		ধুয়ো	ধোঁয়া/ধোঁমা
	মোনাজাল	মনোফিল জাল	
বরফ	বরফ	বলক	
	গোণ	কোটাল	
শুরু	চালু		
নৌকা ডুবে যাওয়া		নৌকা মার খাওয়া	
জালমারা		জালপাতা	

বাক্যের গঠন কীভাবে মৎস্যজীবী ও মউলেদের ব্যবহৃত ভাষাকে সমৃদ্ধ করছে তা লক্ষনীয় -

১। "একবার মধু ভাঙতে গিয়ে নৌকা ডুবি হয়েছে।"[৮]

এই বাক্যের মান্য বাংলা হল - একবার মধু কাটতে গিয়ে নৌকা ডুবে গিয়েছে। অর্থাৎ প্রচলিত বাংলাতে ক্রিয়ার রূপ বদলে যাচ্ছে।

২। "বিশাল বিশাল সাইক্লোনে পড়ছি।"[৯]

এখানে মান্য বাক্যটি হল - বিশাল বিশাল সাইক্লোনে পড়েছি। অর্থাৎ একই বিষয় বোঝাতে কালগত (Tense) এই সুক্ষ্ম পার্থক্য।

৩। "পথমে মা বনবিবির থানে পুজো দিই।"[১০]

মান্য বাংলাতে বাক্যটি হবে মা বনবিবির থানে প্রথমে পুজো দেওয়া হয়। তাহলে এখানে ক্রম ও ক্রিয়ার গঠন বদলাচ্ছে।

৪। "ইঞ্জিন থাকলে কন্ট্রোল করা যায় কিন্তু ইঞ্জিন নেই তো।"[১১]

ইঞ্জিন থাকলে কন্ট্রোল করা যায়। ইঞ্জিন তো নেই। এই দুটি আলাদা বাক্য সংযোজক শব্দ দ্বারা যুক্ত হয়ে যৌগিক বাক্য তৈরি করেছে।

৫। "আমরা যখন যাই তখন চাল-চালান, খাই খাওয়া-দাওয়া নিয়ে যাই।"[১২]

এখানে যখন ও তখন এই শব্দগুলি দ্বারা বাক্যটি জটিল বাক্যে পরিণত হয়েছে।

৬। "ও কোতা বলা যাবিনি।"[১৩]

৭। "আমরা নিয়ম বলতে অমাবস্যা-পূর্নিমায় বেড়াইনা।"[১৪]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 197 - 208
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাধারণত মান্য ভাষাতে ক্রিয়ার পরে 'না' বসে নেতিবাচক বাক্য গঠন হয়। সুন্দরবনের মৌলে ও মৎস্যজীবীদের দ্রুত ব্যবহৃত ভাষায় ক্রিয়ার সাথেই 'না' বা 'নি' শব্দ মিশে নেতিবাচক বাক্য তৈরি হয়েছে। উল্লিখিত শেষের বাক্যদুটি তার উদাহরণ।

ভাষাবৈচিত্র্য নির্মাণে রেজিস্টারের ভূমিকা অপরিসীম। অনেকের মতে পেশাগত বুলিই রেজিস্টার-এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পেশাগত নির্দিষ্ট শব্দের উপর নির্ভর করে রেজিস্টার গড়ে ওঠে না।

> "...ভাষার যে ভিন্নতা তা পরিস্থিতিগত প্রতিবেশে হলে তাকে রেজিস্টার বলে থাকি। রেজিস্টার শাব্দিক স্তরে, ধ্বনিগত স্তরে এবং ব্যাকরণগত স্তরেও হতে পারে...।"[১৫]

মৎস্যজীবী এবং মউলেদের ব্যবহৃত ভাষা থেকে কিছু রেজিস্টারের উদাহরণ তুলে ধরা হল।

নিম্নে কাজ বা পেশাভিত্তিক রেজিস্টারের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল—

১। "...জঙ্গলকে আমরা মার খামার বলি...।"[১৬]

২। "...মধু সংগ্রহ করতে যাচ্ছে যে নৌকা তাকে মহালের নৌকা বলে...।"[১৭]

৩। "...যেহেতু আমরা মার বাদায় থাক..."[১৮]

৪। "...আমরা যে খাঁড়ির ভিতর ঢুকে আমাদের দেশীয় ভাষায় ওটাকে মাল বলা হয়। উঁচু চর হলে আমরা উঁচু মাল বলি।...ওসব এলাকায় বাবুর বসবাস থাকে না।"[১৯]

কিছু সম্পর্ক-ভিত্তিক রেজিস্টারের উদাহরণ হল—

১। "...আমরা পাঁচজন থাকি, চারজন দাঁড়ি একজন হাল। সেই আমাদের মাস্টার...উনি আমাদের যেদিকে নিয়ে যাবে, আমরা সেই দিকে যাব।"[২০]

২। "...যার নৌকা থাকে তাকে সাজনদার বলে, উনি সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছে...।"[২১]

৩। "...একসপ্তাহ পরে মাছ ধরে এনে গাড়ি ভাড়া করে মাছ বিক্রি করতে ডাইমন্ডে যাই... এসে বাবুর হাতে টাকাটা তুলে দিই।"[২২]

উপরের বাক্যগুলিতে পরিস্থিতি অনুযায়ী বক্তারা যাদের সম্পর্কে কথা বলেছেন তাদের উদ্দেশ্যে যথাযথ সম্মান প্রয়োগ করেছেন।

কিছু ধর্ম ও লোকাচার-ভিত্তিক রেজিস্টার হল—

১।"...বনবিবির নাম করে তিনবার আল্লা আল্লা করি, গাজী সাহেবের নাম করে তিনবার আল্লা আল্লা করি তারপর বরকান গাজীর নাম করে তিনবার ডাকি..."[২৩]

২। "... দাদা যখনি বলেছে- মা বনবিবি তুমি রক্ষা কর, তুমি থাকতি নে চলে যাবে..."[২৪]

যুগ্ম শব্দ প্রয়োগে সুন্দরবনের মৎস্যজীবী ও মউলেরা তাদের কথ্য ভাষায় অন্য বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে।

১। "...এমন হয় ধর জাল-ফাল তুলছি বাবু এসে আক্রমণ করল... আবার গেছো এসে আমাদের মধু-টধুগুলো ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে।"[২৫]

২। "... জাল ফেলা শেষ, পাঁচজন এক জায়গায় বসে রান্না-বান্না করি।"[২৬]

৩। "...আমরা যখন যাই তখন চাল-চালান, খাই খাওয়া-দাওয়া নিয়ে যাই।"[২৭]

৪। "... শুক্রবার বনবিবির পুজো হয় অপিসে, পুজো-টুজো দিয়ে পারমিট দিয়ে ছেড়ে দেবে সবাইকে।"[২৮]

আবার, বয়সভেদেও ভাষায় অনেক পরিবর্তন আসতে পারে। যেমন - ধ্বনিগত, শব্দগত, অন্বয়গত। মৎস্যজীবী ও মৌলেদের ব্যবহৃত ভাষায় বয়সভিত্তিক তারতম্য দেখানো হল - অল্পবয়স্কদের কথায় তুলনামূলক ইংরেজি শব্দের আগমন ঘটেছে এবং তারা অনেক বেশি মান্য ভাষার দিকে আকর্ষিত। যেমন - পজিশান, জিপিএস, নাম্বার, ওয়্যারলেস, সিস্টেম, সিজেন, ফিসিং, আইডেন্টি কার্ড, পার্সেন্ট, কমিশান, ফিস পয়েন্ট, মিনিমাম ইত্যাদি। এছাড়া এরা খটি বা কাঁটার পরিবর্তে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 197 - 208
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আড়ত, ডক্‌ের পরিবর্তে ঘাটে শব্দটি বলতে বেশি অভ্যস্ত। কিন্তু অপরদিকে প্রবীণদের মধ্যে বোলন দেওয়া (মাছ ক্রেতাকে ছাড় হিসাবে কিছু মাছ বেশি দেওয়া), খটি বা কাঁটা, ডক্, ছাটা দেওয়া (জঙ্গলে ঢুকে মধুর চাক খোঁজা), ঢাঁড় বা বাস্‌না (চাকের যে অংশে মৌমাছি থাকে), কাটনি মৌলে ইত্যাদি এই ধরনের রক্ষণশীল শব্দের ব্যবহার তুলনাই বেশি এবং কাজের ক্ষেত্রে তারা অনেক বেশি দক্ষশীল। লোকাচারের ক্ষেত্রেও প্রবীণরা যতখানি রক্ষণশীল, তরুণ প্রজন্ম সেক্ষেত্রে কিছুটা শিথিল। জাতিভেদে মৎস্যজীবী ও মৌলেদের ভাষায় অনেক ধরনের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। প্রথমত, মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রে নমঃশুদ্র, ধোবা, তাঁতি, মাহিষ্য, রাজবংশী ইত্যাদি তপশিলি। আবার মৌলেরাও অনেকে রাজবংশী বা জেলে-মালো হয়ে থাকে। এদের জাতিগত পরিচয় কাজের ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রথমটি হল-শব্দভাণ্ডার। মৌলেদের মধ্যে রাজংশীরা 'বোলেন' বলছে, যাকে জেলে-মৌলেরা তাকে 'বাড়ন' বলছে। রাজংশীরা যাকে 'সাজনদার' বলছে, জেলেরা তাকে 'সাজুনি' বলছে। রাজংশীরা যে অংশকে 'চাক্' বলছে, জেলে-মৌলেরা তাকে 'ঢাঁড়' বা 'বাস্‌না' বলছে। রাজংশীরা যাকে 'গেছুরে' বলছে, জেলে-মৌলেরা তাকে 'কাট্‌নি মৌলে' বলছে। মৎস্যজীবীদের মধ্যেও জাতিভেদে কোটালকে গোণমুখ, খেপের বোটকে চালানের বোট, জাল পাতাকে জাল মারা, মাঝিকে মাস্টার, মোনা জালকে মনোফিল জাল, নৌকা ডুবে যাওয়াকে, নৌকা মার খাওয়া ইত্যাদি বলছে। এই জাতিগত কারণে মৎস্যজীবী ও মৌলেদের ভাষায় উচ্চারণগত তারতম্য লক্ষ করা যায়। যা তাদের ভাষাকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে, একইসাথে তারা পেশার কারণে ভাষার মাধ্যমে অনেকখনি জাতিগত মর্যাদা লাভ করেছে।

সমাজভাষা নির্মাণে পেশার অবদানের ক্ষেত্রে মৎস্যজীবী ও মউলেদের পেশাকেন্দ্রিক শব্দভাণ্ডার অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। মৎস্যজীবীদের কাজের ভাষা—

ভাগি (অংশীদার), দমা (সাগরের উচ্চতম ঢেউ), রুলিং (হাওয়া), কলেস্টর (যে পাত্রে মাছ সাজিয়ে বরফ দেওয়া হয়), লেফটিন (টলারের পিছন), লকবুক (মাছ ধরার অনুমতি পত্র), জুগি (যিনি জোগাড় দেন), বাইজজানি (যা দিয়ে বরফ ভাঙা হয়), মাস্টার (মাঝি), মাল (নদীর চর), দো-ভাঁটা (দুবার ভাঁটা), খাঁড়ি (সমুদ্রের গায়ে গভীর খালের মতো অংশ), ঝিরা (চরের মধ্যবর্তী ছোট জলপথ), জালপাতা (জাল ফেলা), মার বাদা (জঙ্গল), গোণমুখ (একাদশী থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত), গ্রাফি (নোঙর), বি.এল.সি (মাছ ধরার অনুমতি পত্র), উজোন (ভাঁটার বিপরীতে), সুজোন (ভাঁটার অনুকূলে), বাবু (বাঘ), আড়া (সমুদ্রের মুখ), খটি (আড়ৎ), জাঁত করা (মাছ গুছিয়ে বরফে রাখা) ইত্যাদি। আবার মউলেদের কাজের ভাষা হল - দোল্‌ফা (মধু সংগ্রহের জন্য দেওয়া দ্বিতীয়বারের পাস), ছাটা দেওয়া (জঙ্গলে মধু খোঁজা), গেছুরে বা কাটনি মউলে (যে ব্যক্তি গাছে উঠে মধু কাটে), আড়িওয়ালা (যে ব্যক্তি মধু ভর্তি হাড়ি নৌকাতে আনে, বাউলি (যিনি মন্ত্র দ্বারা জঙ্গল ও বাঘের মুখ বন্ধ করে), গালা (চাকের যে অংশে মধু থাকে), বাস্‌না বা ঢাঁড় (চাকের যে অংশে মৌমাছির বচ্চারা থাকে) বোলন বা বাড়ন (মাথায় হেঁতালি পাতা জড়ানো একটি লাঠি, যার সাহায্যে ধোঁয়া করা হয়), সাজনদার বা সাজুনি (যিনি নৌকা সাজিয়ে মধু সংগ্রহ করতে যায়), মহালের নোউকা (যে নৌকাতে করে মধু সংগ্রহ করতে যাওয়া হয়), মায়ের খামার (জঙ্গল), ভুড়েল (যিনি মধু সংগ্রহকালে নৌকাতে থাকে), বাল্ (মধুর বড় চাককে বলা হয়), গোলামেটে (যে পাত্রে মধু কেটে এনে রাখা হয়), কুঁ-দেওয়া (মউলেদের পারস্পারিক যোগাযোগের সাংকেতিক শব্দ) ইত্যাদি।

মৎস্যজীবী ও মউলে উভয় পেশার ক্ষেত্রে এমন কিছু ভাষা রয়েছে যা শব্দ দিয়ে কাজকে ফুটিয়ে তোলে। এই ধরনের ভাষাকে কারিগরী ভাষা বলা হয়। পেশা ও ভাষার সম্পর্ক নির্মাণে এর ভূমিকা অনবদ্য। নিচে উভয় পেশাকেন্দ্রিক কিছু কারিগরী ভাষার উদাহরণ দেওয়া হল —

চাক কাটা, ছাটা দেওয়া, কুঁ-দেওয়া, মৌমাছি তাড়ানো, বোলেন ধরানো, ধোঁয়া করা, বাঘের মুখ বন্ধ করা, জাল পাতা, দাঁড় বাওয়া, বরফ ভাঙা, জাত করা, জাল তোলা, দোণ ফেলা, হাল বাওয়া ইত্যাদি।

সমাজভাষার ব্যাখ্যায় কোড মিক্সিং, কোড সুইচিং, বহু-ভাষিকতা, দ্বি-ভাষিকতার মতো কিছু উপাদান জরুরি আবেদনের জায়গা রাখে। একটি বাক্যের মধ্যে দুই বা ততোধিক ভাষার শব্দ মিশে এই কোড মিক্সিং তৈরি হয়। সুন্দরবনের মৎস্যজীবী ও মউলেদের ভাষাতে কোড মিক্সিং প্রচুর পরিমাণে লক্ষ করা যায়। যথা -

১। "...ফের পজিশন মতো জি.পি.এস নাম্বার থাকে, প্রত্যেকটা টলারের সাথে ওয়ারলেস সিস্টেম করা থাকে।"[২৯]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 197 - 208
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এখানে বাংলার সাথে পজিশন, জি.পি.এস, নাম্বার, সিস্টেম এই ইংরেজি শব্দগুলো যুক্ত হয়েছে।

২। "...লাশ আনতে গেলে আরও জখম হয়...।"[৩০]

এখানে বাংলার সাথে ফরাসী শব্দ জখম যুক্ত হয়েছে।

৩। "...বছরে একবার এই একমাসের জন্য পাস দেবে...।"[৩১] এখানে পাস একটি ইংরেজি শব্দ।

দুটি ভাষা সমানভাবে দক্ষতার সাথে ব্যবহারকারীকে দ্বি-ভাষিক বলা হয়। মৎস্যজীবী ও মৌলেদের দ্বি-ভাষিকতার কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল—

১। "...ভারতের মধ্যে আমরা ফিসিং জীবনযাপন করি...নোঙরটা পথম ফ্যালাবো, দিয়ে মেশিনের সাহায্যে জাল পড়বে...আমাদের দেখা যাটে মাছ যখন বেশি লেগে গেছে তখন আর জাল ফ্যালাবো না...।"[৩২]

২। "এখান থেকে আমরা বাজার ঘাট সব করে নিয়ে এক সপ্তাহের জন্য গেলাম... জাল তুলে লৌকায় মাছ সব এট্টা এট্টা কুরে বাছতি হয়...।"[৩৩]

সমীক্ষারত পরিস্থিতিতে বক্তা প্রথমে সচেতনভাবে মান্য বাংলায় কথা বলা শুরু করলেও, শেষের দিকে নিজের আঞ্চলিক ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্যে ফিরে গেছেন। সুন্দরবনের মৎস্যজীবী ও মৌলেদের কথ্য ভাষায় কোড সুইচিং ও বহুভাষিকতার কোন লক্ষণ পাওয়া যায়নি।

পেশার সাথে সংস্কৃতির ঘনিষ্ট যোগসূত্র। কারণ যে কোন পেশার মানুষ যে কাজ করুন না কেন, সেই কাজের অভ্যাস, প্রকৃতি, বিশ্বাস, আচার সবটাই ধারণ করে রাখে সংস্কৃতি। আবার ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, সংস্কৃতির প্রকাশ মাধ্যমও এই ভাষা। মৎস্যজীবী থেকে মৌলে উভয় পেশার সাথে যুক্ত মানুষের যাপন, বিশ্বাস, আচার, মূল্যবোধ সবটাই ধরা থাকে তাদের সংস্কৃতিতে। তাই মৌলে ও মৎস্যজীবীদের যে সংস্কৃতি তা নতুন ভাষাকে গড়তে সাহায্য করছে আবার ভাষা এই উভয় পেশার সংস্কৃতিকে বর্ণনা করতে সাহায্য করছে। মৎস্যজীবীদের পেশাকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকাচারগুলি হল -

১। অঞ্চলভেদে বৃহঃস্পতিবার, কোথাও শনি- মঙ্গলবার আবার অমাবস্যা-পূর্ণিমায় কোন কোন মৎস্যজীবী মাছ ধরতে বেরোয় না।

২। নৌকা পূজাতে ঘটের মুখে কলার ব্যবহার অথবা সবজি হিসেবেও কলা কখনও নৌকায় উঠবে না।

৩। মাংস সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, কোন কোন টলারে বা নৌকাতে ডিমও খাওয়া বারণ।

৪। যেদিন নৌকা প্রথম নদী বা সমুদ্রে যাবে সেদিন পুরোহিত ডেকে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে পূজা দিতে হবে, এবং মালিকসহ যারা যাবে তারা সবাই ঐদিন নিরামিষ খাবে।

৫। মৎস্যজীবীদের স্ত্রীরা সিঁদুর পরবে না, চুল আঁচড়াবে না, নখ কাটবে না, বাড়িতে ঝুল ঝাড়া যাবে না, ভিক্ষা দেওয়া যাবে না, কাপড় কাচবে না, কাউকে ঋণ দিতে পারবে না, মাথায় শ্যাম্পু দেবে না, ঘরদোর পরিষ্কার করে নোংরা ফেলে দেবে না, ব্যাগে ভরে রাখবে, অনেকে আবার মাংস, ডিম খাবে না।

৬। মৎস্যজীবীরা নদীতে থাকাকালীন প্রতিদিন নৌকায় পূজা দেয়, তাছাড়া ফেরার দিন অনেকে বনবিবির উদ্দেশ্যে জঙ্গলে পূজা দিয়ে আসে। এই সময় তারা বনবিবি, গাজীসাহেব ও বরকান গাজীর নাম করে তিনবার আল্লা আল্লা উচ্চারণ করে। আবার বছরে একবার সব মৎস্যজীবীরা মিলে ক্ষীর, ডালা দিয়ে গ্রামে বনবিবির পূজা দেয়।

একইভাবে মৌলেদেরও নিজেদের পেশাকেন্দ্রিক একাধিক বিশ্বাস ও লোকাচার রয়েছে -

১। বৃহঃস্পতিবারে মহালে যাওয়া নিষিদ্ধ।

২। মধু সংগ্রহ করতে যাওয়ার সময়ে মৌলেরা বনবিবির পূজা করে, গুরুজনদের প্রনাম করে আশির্বাদ নিয়ে যায়।

৩। মহালে যাওয়ার সময় সাজনদারের স্ত্রী নৌকায় একঘটি জল দিয়ে ঠেলে দেয়, যাতে ঘটির জলের মতো নৌকা ভরে তারা মধু পায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 197 - 208
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৪। মৌলেদের অবর্তমানে তাদের স্ত্রীরা বাড়িতে তেল, সিঁদুর মাখতে পারবে না, তবে অনেকে সুর্যোদয়ের আগে তেল, সিঁদুর মেখে নেয়, ভিক্ষা দিতে পারবে না, কাউকে বসার জায়গা দিতে পারবে না, তবে সন্ন্যাসীদের বসার জায়গা দিতে পারবে, উনুন জ্বালাতে পারবে না। দিনের বেলায় বিছানাতে শুতে পারবে না, মাটিতে আঁচল বিছিয়ে শুতে পারবে কিন্তু ঘুমাতে পারবে না। রাত্রে ঘুমাতে পারবে। যাবতীয় ঘরকন্নার কাজ সূর্য ওঠার আগে করবে।
৫। শুক্রবার নৌকাতে এবং বাড়িতে অনেকে আতপ চালের ভাত খায়। আবার অনেক মৌলেদের বাড়িতে এদিন রান্নাই বন্ধ থাকে, সারাদিন পান্তাভাত খাবে এবং রাত্রে রান্না হবে।
৬। মহাল থেকে ফেরার দিন নদীর চরে জঙ্গলের মধ্যে বনবিবির ছোটো প্রতিমা বসিয়ে ফুল-মালা, ধূপ-ধুনো দিয়ে মৌলেরা পূজা করে। যাকে তারা মহাল ফেরত পূজা বলে। এইসময়ে তারা অতিরিক্ত বোলেনগুলিকে তারা পুড়িয়ে দেয়।
মৌলে ও মৎস্যজীবীদের পেশাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি থেকে যে লোকভাষাগুলি পাওয়া যাচ্ছে, তা হল- ডালা পুজা, ক্ষীর দেওয়া, মহাল ফেরত পূজা, হাজত পুজা, জাকাত পূজা ইত্যাদি। পেশাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি থেকেই এই ভাষাগুলির সৃষ্টি হচ্ছে। যা সমাজভাষাবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে অভিনব।

সমাজভাষাচর্চায় পেশা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা। কিন্তু পেশাকেন্দ্রিক ভাষাচর্চার পরিসর অনেক বৃহৎ। কেবল পেশা নয়, সমাজভাষা নির্মানে বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা এই যে মাত্রাগুলি রয়েছে সেগুলির প্রেক্ষিত থেকে সমাজভাষার গন্তব্যকে সুদূরপ্রসারী করে তোলা সম্ভব। সমাজের যেকোন জাতি, শ্রেণি বা গোষ্ঠীর মানুষের নিজস্ব ইতিহাসকে স্ব-মহিমায় টিকিয়ে রাখতে হলে, তাদের সংস্কৃতিকে, ভাষাকে সংরক্ষিত করা একান্ত জরুরি। এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে সমাজভাষা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। যদি তা না হয় এই পন্থার বিকল্প হিসেবে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ভাষা বিলুপ্তি থেকে ভাষার মৃত্যু, জাতির বিলুপ্তি থেকে মানুষের ইতিহাসের বিলুপ্তিকরণে আমাদেরকেই সাক্ষি হিসাবে থেকে যেতে হবে।

Reference:

১. নাথ, মৃণাল, *ভাষা ও সমাজ,* নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরনী, কলকাতা, প্রকাশ কাল-জানুয়ারী: ১৯৯৯, পৃ. ১১
২. তদেব, পৃ. ১২
৩. সরকার, পবিত্র, *ভাষা, দেশ, কাল,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, প্রথম ‘মিত্র ও ঘোষ’ সংস্করণ, পৌষ ১৪০৫, পৃ. ১৫৬
৪. সাক্ষাৎকার: নকুল ধাউরিয়া, পাথরপ্রতিমা, বয়স-৩৬, তারিখ-৩১/১২/২৫
৫. সাক্ষাৎকার: মন্টু বিশ্বাস, গোসাবা, বয়স-৫৫, তারিখ-২৯/০৩/২৬
৬. সাক্ষাৎকার: গোবিন্দ মণ্ডল, পাখিরালয়, বয়স-৬১+, তারিখ-৩১/০৩/২০২৬
৭. সাক্ষাৎকার: তারক সরদার, পাখিরালয়, বয়স-৪৯, তারিখ-৩১/০৩/২৬
৮. সাক্ষাৎকার: মহীধর হালদার, মৈ-পীঠ, বয়স-৬০+, তারিখ-২২/০২/২১
৯. সাক্ষাৎকার: অজয় প্রধান, নামখানা, বয়স-৫৩, তারিখ-০১/০১/২৬
১০. সাক্ষাৎকার: তারক সরদার, পাখিরালয়, বয়স-৪৯, তারিখ-৩১/০৩/২৬
১১. সাক্ষাৎকার: বিজয় মণ্ডল, সোনা-গাঁ, বয়স-৪০+, তারিখ-০৩/০৪/২৬
১২. সাক্ষাৎকার: রানা দাস, গোসাবা, বয়স-৪৩, তারিখ-২৯/০৩/২৬
১৩. সাক্ষাৎকার: গোবিন্দ মণ্ডল, পাখিরালয়, বয়স-৬১+, তারিখ-৩১/০৩/২০২৬
১৪. সাক্ষাৎকার: রানা দাস, গোসাবা, বয়স-৪৩, তারিখ-২৯/০৩/২৬
১৫. সাক্ষাৎকার: নাথ, মৃণাল, *ভাষা ও সমাজ,* নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরনী, কলকাতা, প্রকাশ কাল-জানুয়ারী: ১৯৯৯, পৃ-৬৫
১৬. সাক্ষাৎকার: গোবিন্দ মণ্ডল, পাখিরালয়, বয়স-৬১+, তারিখ-৩১/০৩/২০২৬
১৭. সাক্ষাৎকার: তারক সরদার, পাখিরালয়, বয়স-৪৯, তারিখ-৩১/০৩/২৬

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 26
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 197 - 208
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৮. সাক্ষাৎকার: বিজয় মণ্ডল, সোনা-গাঁ, বয়স-৪০+, তারিখ-০৩/০৪/২৬
১৯. সাক্ষাৎকার: তদেব।
২০. সাক্ষাৎকার: বিজয় মণ্ডল, সোনা-গাঁ, বয়স-৪০+, তারিখ-০৩/০৪/২৬
২১. সাক্ষাৎকার: গোপাল মণ্ডল, পাখিরালয়, বয়স-৬৩, তারিখ-৩১/০৩/২৬
২২. সাক্ষাৎকার: দীপঙ্কর দাস, নামখানা, বয়স-৩৮, তারিখ-২৭/১২/২৫
২৩. সাক্ষাৎকার: বিজয় মণ্ডল, সোনা-গাঁ, বয়স-৪০+, তারিখ-০৩/০৪/২৬
২৪. সাক্ষাৎকার: রঙ্গলাল মণ্ডল, বাসন্তী, বয়স-৬০, তারিখ-১৭/০২/২১
২৫. সাক্ষাৎকার: গুরুপদ সাউ, গোসাবা, বয়স- ৪৬, তারিখ-১৩/০৪/২১
২৬. সাক্ষাৎকার: বিজয় মণ্ডল, সোনা-গাঁ, বয়স-৪০+, তারিখ-০৩/০৪/২৬
২৭. সাক্ষাৎকার: রানা দাস, গোসাবা, বয়স-৪৩, তারিখ-২৯/০৩/২৬
২৮. সাক্ষাৎকার: তারক সরদার, পাখিরালয়, বয়স-৪৯, তারিখ-৩১/০৩/২৬
২৯. সাক্ষাৎকার: রতন দাস, কাকদ্বীপ, বয়স-৩৩, তারিখ-২৭/১২/২৫
৩০. সাক্ষাৎকার: মন্টু বিশ্বাস, গোসাবা, বয়স-৫৫, তারিখ-২৯/০৩/২৬
৩১. সাক্ষাৎকার: গোবিন্দ মণ্ডল, পাখিরালয়, বয়স-৬১+, তারিখ-৩১/০৩/২০২৬
৩২. সাক্ষাৎকার: নকুল ধাউরিয়া, পাথরপ্রতিমা, বয়স-৩৬, তারিখ-৩১/১২/২৫
৩৩. সাক্ষাৎকার: মন্টু বিশ্বাস, গোসাবা, বয়স-৫৫, তারিখ-২৯/০৩/২৬

Bibliography:

নাথ, মৃণাল, *ভাষা ও সমাজ,* নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরনী, কলকাতা, প্রকাশ কাল-জানুয়ারী: ১৯৯৯।
সরকার, পবিত্র, *ভাষা, দেশ, কাল,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ, পৌষ ১৪০৫।
শ, রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ৮ই ফাল্গুন, ১৩৯০ (প্রথম খণ্ড)।
ড. চৌধুরি, দুলাল, ড. সেনগুপ্ত পল্লব, *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ,* পুস্তক বিপণি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ২০১৩।
মণ্ডল, বরেন্দু(সম্পাঃ), *দ্বীপভূমি সুন্দরবন,* ছোঁয়া, ১৮ এ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা, বইমেলা ২০২০(প্রথম প্রকাশ)।
চৌধুরি, কমল, *চব্বিশ পরগনা উত্তর-দক্ষিণ-সুন্দরবন,* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৩।